মুসলিমদের পারস্য বিজয়ের

ইতিহাস

বই	**মুসলিমদের পারস্য বিজয়ের ইতিহাস**
লেখক	এনামুল করীম ইমান
সম্পাদনা	মুহাম্মদ পাবলিকেশন সম্পাদনা পর্ষদ
নিরীক্ষণ	মাহদি হাসান
বানান	মুহাম্মদ পাবলিকেশন সম্পাদনা পর্ষদ
প্রচ্ছদ	মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
অঙ্গসজ্জা	মুহাম্মদ পাবলিকেশন গ্রাফিক্স টিম

মুসলিমদের পারস্য বিজয়ের ইতিহাস

[সূচনা থেকে সমাপ্তি]

এনামুল করীম ইমাম

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

মুসলিমদের পারস্য বিজয়ের ইতিহাস

এনামুল করীম ইমাম

একুশে বইমেলা ২০২২

প্রকাশনায়

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

ইসলামি টাওয়ার, আন্ডারগ্রাউন্ড, দোকান নং # ১৮
১১/১ ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৩১৫-০৩৬৪০৩, ০১৬২৩-৩৩৪৩৪২

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

অনলাইনে অর্ডার করুন
ওয়েলরিচ বিডি.কম-এ
www.wellreachbd.com
ইসলামি টাওয়ার, আন্ডারগ্রাউন্ড, দোকান নং # ১৮
১১/১ ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৮১১-৫৭০ ৫৪০, ০১৮৩১-৩৪ ৫১ ৯১
অথবা rokomari.com & wafilife.com -এ

বইমেলা পরিবেশক
বাংলার প্রকাশন

মূল্য : BD ৳ ৩৮০, US $ 20, UK £ 13

MUSLIMDER PAROSSO BIJOYER ITIHAS
Writer : Anamul Korim Amam

Published by
Muhammad Publication
Islami Tower, UnderGround, Shop # 42
11/1 Islami Tower, Banglabazar, Dhaka-1100
+88 01315-036403, 01623-334342
https://www.facebook.com/muhammadpublicationBD/
muhammadpublicationBD@gmail.com
www.muhammadpublication.com

ISBN : 978-984-95377-7-9

স্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা, ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

অর্পণ

দানবীর আলহাজ্জ আবদুস সাত্তার
প্রতিষ্ঠাতা ও মুতাওয়াল্লি
হেরার পথে জামিয়াতুল হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু ও
রমজান আলী কলেজ, জয়রা, মানিকগঞ্জ।

প্রকাশকের কথা

আপনি যদি আমাকে প্রশ্ন করেন, ইসলামের ইতিহাসে
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিজয়ের ইতিহাস কোনটি?
তাহলে আমি নির্দ্বিধায় বলবো-

'পারস্য বিজয়।'

—মুসলিম দার্শনিক ও কবি আল্লামা ইকবাল

পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া যে সকল ঘটনা ইতিহাসের মোড় পরিবর্তন করেছে, মুসলিমদের পারস্য বিজয় তন্মধ্যে অন্যতম। এ বিজয়ের মাধ্যমে সমগ্র ইরাক অঞ্চলের ওপর মুসলিমদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পারস্য ও রোম বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন—

وَلَيُفْتَحَنَّ كُنُوزُ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ

'এরাই (আমার সাহাবিরা) একদিন পারস্য সম্রাট কিসরা ইবনে হুরমুজের ধনভান্ডার জয় করবে।'

যা আবু বকর ও উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুমার খিলাফতকালে বাস্তবায়িত হয়েছিল। পারস্য বিজয়ের সাথে সাথে জালুলা, হুলওয়ান প্রভৃতি এলাকাও মুসলিমদের দখলে চলে আসে।

মুসলিম ইতিহাস প্রকাশের ধারাবাহিকতায় এবার আল্লাহ তাআলার মেহেরবানিতে ইসলামি সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে প্রসিদ্ধ ঢাকার দারুর

রাশাদ মাদরাসার সম্মানিত উস্তাদ এনামুল করীম ইমাম রচিত 'মুসলিমদের পারস্য বিজয়ের ইতিহাস' বইটি মুহাম্মদ পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। আল্লাহ লেখককে উত্তম বিনিময় দান করুন।

বইটি ভাষা সম্পাদনা করেছেন বরাবরের ন্যায় আপনাদের প্রিয় কুতুব হিলালী। বানান সমন্বয় করেছেন মাকামে মাহমুদ।

ইতিহাসের বই প্রকাশ করা বেশ কঠিন। ইতিহাসের নানান সন-তারিখ; ব্যক্তি, স্থান-স্থাপনার সঠিক উচ্চারণ; সবই তাহকিক করে বসাতে হয়। যেটাকে আমরা বলি লেখকের লেখা বা অনুবাদকে নিরীক্ষণ করা। যাচাই করা। নিরীক্ষণ এর এই কঠিন কাজটি করেছেন মাহদি হাসান। আল্লাহ তাকেও উত্তম বিনিময় দান করুন।

সবশেষ কথা—আমরা চেষ্টা করেছি বিভিন্ন স্থান, স্থাপনা ও ব্যক্তির সঠিক নাম উল্লেখ করে ভাষা-বানানের সমন্বয় করে বইটি প্রকাশ করতে। কতটুকু পেরেছি তার ফলাফল আপনাদের হাতে। ভুল-শুদ্ধ সবই জানানোর অনুরোধ রইল।

আল্লাহ তাআলা বইটির সঙ্গে লেখক, সম্পাদক, প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে জাজায়ে খায়ের দান করুন। বইটি সত্যান্বেষণকারীদের নিকট গ্রহণযোগ্য করুন। আমিন।

—মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২

শরিক হতে চাই বিজয়ের মিছিলে...

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

বিশ্ব ইতহাসে অবিস্মরণীয় অধ্যায় হলো الفتوحات الإسلامية (আল-ফুতুহাতুল ইসলামিয়্যাহ) বা ইসলামের দিগ্‌বিজয়। লক্ষণীয় যে, আরবরা ছিল বর্বর জাতি। ইসলামের ছোঁয়া ছাড়া তাদের এই বিজয় কিছুতেই সম্ভব ছিল না। সুতরাং এই দিগ্‌বিজয়ে আরবদের বাহুবলের কোনো অংশ নেই। অবশ্য এই দিগ্‌বিজয়ের মধ্য দিয়ে প্রমাণ হয় যে, ইসলাম হলো সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ও মানবিক ধর্ম। আর মুসলমানরা হলো পৃথিবীর সবচেয়ে দয়ালু জাতি।

আমরা লক্ষ করি, ইসলামের দিগ্‌বিজয়ে তরবারি কখনও মুখ্য ভূমিকা পালন করেনি। ইসলামের অনুকরণীয় আদর্শ ও অমুসলিমদের নৈতিক অধঃপতন মুসলিমদের বিজয়ী হতে সহায়তা করেছে। অবশ্য ইসলাম বিদ্বেষীরা এই দিগ্‌বিজয়কে তাতার, মোঙ্গল, জার্মান, ভেন্ডাল ও হুনদের বিজয়ের সাথে তুলনা করার অপপ্রয়াস চালায়। মুসলমানদের ধর্মান্ধ ও ধনলিপ্সু হিসেবে চিত্রিত করতে চায়। আসলে বাস্তবতার সাথে এর কোনো মিল নেই।

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দিগ্‌বিজয়ের সূচনা করেছিলেন সপ্তম শতাব্দির গোড়ার দিকে। খিলাফতে রাশেদার যুগে এগুলো আরও সম্প্রসারিত হতে থাকে। ধীরে ধীরে আরব উপদ্বীপ ক্ষমতার ভরকেন্দ্রে পরিণত হয়। উমাইয়া ও আব্বাসিয়া যুগে মুসলমানরা বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়ে ওঠে। চীন, ভারত, মধ্য এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা,

ভূমধ্যসাগরীয় সিসিলি দ্বীপ ছাড়িয়ে ইউরোপীয় আইবেরি উপদ্বীপ ও পিরেনীজ পর্যন্ত পৌঁছে যায় ইসলাম ও মুসলিমদের দিগ্‌বিজয়।

মাত্র ২৪ বছরের মধ্যে মুসলিমদের বিজয়াভিযানে প্রাচীন ভারতীয় ও মিসরীয় সভ্যতা মুসলিমদের কাছে মাথানত করে। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে এবং পারস্য সাম্রজ্যের পতন ঘটে। পারস্য সাম্রাজ্যের পতনের মধ্য দিয়ে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণিত হয়।

জরথুস্ট্রীয় ধর্মের অনুসারী পারস্যের সাসানি শাসকরা জনগণের ওপর নির্যাতনের স্টিম রোলার চালাত। এজন্য সাম্রাজ্যের ইহুদি, খ্রিস্টান ও মূর্তিপূজকরাও মুক্তিদাতা হিসেবে মুসলমানদের স্বাগত জানায়। তারা প্রকাশ্যেই বলেছিল—

'আমরা তোমাদের সুবিচার পছন্দ করি। আমরা স্বৈরশাসনের আওতায় বসবাস করছি। আমরা নির্যাতনের শিকার। এমন জুলুম-নির্যাতনের চেয়ে তোমাদের মতো ভিনজাতির শাসন অনেক ভালো।'

মুসলিমদের এই বিজয়াভিযান কখনোই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। বন্ধুর মহাবিপদসংকুল পথ পাড়ি দিয়েই তাঁদের এগিয়ে যেতে হয়েছে সবসময়। এই অগ্রাভিযানে কোথাও মুসলিমদের সৈন্যসংখ্যা শত্রুদের চেয়ে বেশি ছিল না। প্রায় যুদ্ধেই প্রতিপক্ষের তুলনায় পাঁচ থেক দশ গুণ কম সৈনিক নিয়ে তারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। তবে ঈমানই ছিল তাদের অজেয় শক্তি। মুসলিম কমান্ডার মুসান্না ইবনুল হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহু অকপটে বিজয়ের রহস্য প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছিলেন—

'জাহেলি যুগেও পারসিকদের সাথে আরবদের অনেক লড়াই হতো। তখন একশো পারসিক এক হাজার আরবের তুলনায় ছিল বেশি শক্তিশালী। ইসলামের কারণে আল্লাহ তাআলা আরবদের শক্তি বৃদ্ধি করেছেন। আর ওদের শক্তি ছিনিয়ে নিয়েছেন। এখন একশো আরবকে এক হাজার পারসিকের তুলনায় বেশি শক্তিশালী করে দিয়েছেন।'

অনেকদিক থেকেই পারস্য সাম্রাজ্য ছিল অনন্য। ইতিহাসে এটাই ছিল সত্যিকারার্থে বিশাল সাম্রাজ্য। এর সমৃদ্ধির সময়ও ছিল উল্লেখ করার মতো। ইতিহাসে একটি সাংস্কৃতিক, সামরিক শক্তি ও সভ্যতা হিসেবে আর কোনো সাম্রাজ্য এতদিন স্থায়ী হয়নি। অবশ্য অন্যান্য সাম্রাজ্যের মতোই অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে একে অগ্রসর হতে হয়েছে।

পারস্য সাম্রাজ্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, বাইরের কোনো লোক কখনও পারস্য শাসন করতে পারেনি। সবসময় পারস্যের লোকেরাই পারস্য শাসন করেছেন। এর ইতিহাসও অতি দীর্ঘ।

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পারস্য বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে আমরা এই ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবায়ন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট ইতিহাসকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। পাশাপাশি সাম্রাজ্যের ইতিহাসও আলোচিত হয়েছে সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত। আশা করি পাঠক এর থেকে মনের খোরাক খুঁজে পাবেন।

ইতিহাসের পাঠকমাত্রই জানেন, ইতিহাসে মত ও পথের অভাব নেই। সুতরাং এক্ষেত্রে মতবিরোধ খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। তারপরও আমরা বিতর্কিত বিষয়গুলোকে যথাসম্ভব এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছি। সঠিক ও গ্রহণযোগ্য মতটি আপনাদের সমীপে পেশ করার চেষ্টা করেছি সবসময়। এরপরও কোনো ভিন্নমত লক্ষ করলে জানিয়ে বাধিত করবেন বলে আশাবাদী।

শুকরিয়া জ্ঞাপন করি মুহাম্মদ পাবলিকেশনের স্বত্বাধিকারী মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ খানসহ সংশ্লিষ্ট সবার। তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে বইটিকে সুন্দর থেকে সুন্দর করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। আল্লাহ তাআলা সবাইকে শান অনুযায়ী প্রতিদানে ভূষিত করুন। দুনিয়াতে কবুল করুন এবং আখিরাতে নাজাত দিয়ে ধন্য করুন। লেখক, প্রকাশক, পাঠক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে ওই বিজয়ের মিছিলে শরিক হওয়ার তাওফিক দান করুন।

পাঠক, ভালো থাকুন। সুস্থ থাকুন। শুভ কামনা রইল।

—এনামুল করীম ইমাম
৩০. ১১. ২০২১
মাদরাসা দারুর রাশাদ
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

সূচিপত্র

প্রত্যাশিত অভিযাত্রা-১৯

একজন আব্বাস ২১
দৃষ্টি জগ্রোস পর্বতমালায় ২৭
পারস্যের রাজদরবারে ৩২
পারস্য ও কিসরা ৩৩
পারস্য সাম্রাজ্য ৩৬
মিদ্দীয় যুগ ৩৭
হখামনি, হাখামানেশি বা একিমেনীয় যুগ ৩৭
ইউনানি (সেলিউকীয়) রাজত্ব ৩৯
পার্থিয়ান যুগ ৪১
আশকানি রাজত্ব ৪১
সাসানি যুগ (২২৬-৬৫২ খ্রিষ্টাব্দ) ৪১
দ্বিতীয় খসরু বা খসরু পারভেজ ৪৪
খসরু পারভেজের ধর্ম ৪৫
নবিজির বদ-দুআ ৪৬
প্রথম খলিফার যুগে ৫৪
লাখমি রাজত্ব ৫৭

পারস্যের প্রথম জয়-৬১

যাতুস-সালাসিল যুদ্ধ ৬১
সানির যুদ্ধ ৬৩
ওয়ালজাহর যুদ্ধ ৬৪
খ্রিষ্টান গোত্র বনু বকর ৬৬
উল্লাইসের যুদ্ধ ৬৭

যুদ্ধ ছাড়াই হিরা বিজয় ৭০
প্রেমের বিষ পান ৭৩
অপূর্ব রণকৌশলে আনবার জয় ৭৬
আইনুত-তামার ৭৭
মিলিত হলেন ইয়াজের সাথে ৮০
দুমাতুল জান্দাল ৮০
বিশ্বাসঘাতক উকাইদির ৮২
দৃশ্যপটে জুদি ৮৩
হুসাইদ ও মুজাইয়াহ যুদ্ধ ৮৫
অভিযান ফিরাজ ৮৬
হজে গেলেন খালিদ ৮৯
ফিল্ড কমান্ডার মুসান্না ৯০
বাবেল যুদ্ধ ৯১
প্রথম খলিফার শেষ আকাঙ্ক্ষা ৯৪
খলিফা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ৯৫
নামারিক যুদ্ধ ৯৯
কাসকর অভিযান ১০০
বারুসমার যুদ্ধ (জালিনুসের যুদ্ধ) ১০১
সেতু যুদ্ধ (জিসরের যুদ্ধ) ১০২
ছোট্ট ভুল বিরাট খেসারত ১০৩
একটি স্বপ্নের খোঁজে ১০৫
গায়েবি মদদ ১০৬
দুঃখ প্রকাশ ১১২
নারী মুজাহিদরাও কম ছিলেন না ১১২
নতুন সম্রাট ইয়াজদাগরিদ (তৃতীয়) ১১৩
লড়ে যায় বীর ১১৫
বেজে উঠল যুদ্ধের দামামা ১১৬
মহাবীর সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ১১৬
বিদায় মহাবীর মুসান্না ১২৩
আজানের সুরে কাঁপে রুস্তম ১৪১
মল্লযুদ্ধেও পারল না ওরা ১৪২
তুলাইহার ফিরে আসা ১৪৪
আরমাস দিবস ১৪৬
মায়ের ভালোবাসা ১৪৬

মহাবীর কাকার কৌশল ১৪৮
প্রতিশোধ ১৪৯
আগওয়াস দিবস ১৪৯
কাকার অবিস্মরণীয় বীরত্ব ১৫০
পেছনে ফেরা না ফেরার গল্প ১৫০
ভুল থেকে শিক্ষা ১৫১
কাকার কৌশল ১৫৫
আমাস দিবস ১৫৬
সাহস কত রুস্তমের ১৫৭
হাতি হলো বুমেরাং ১৫৮
লাইলাতুল হারির ১৫৯
কাদেসিয়া দিবস ১৬০
ধরাশায়ী মহাবীর রুস্তম ১৬১
রুস্তমের মৃত্যু সম্পর্কিত দুটি অভিমত পাওয়া যায় ১৬২
যুদ্ধের সমাপ্তি ১৬৫
কাদেসিয়া থেকে মদিনা ১৬৬
আজানের প্রতিযোগিতা ১৬৯
অভিযান বাহুরাশির ১৭০
পারস্যের রাজধানী ১৭৩
মাদায়েন বিজয় ১৭৪
ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ নদী পার হইলো ১৮৫
শ্বেত প্রাসাদে ১৮৮
মুসলিমদের সততা ১৯০
শীর্ষ সাহাবায়ে কিরামের অভিব্যক্তি ১৯২
জালাওলা যুদ্ধ ১৯৯
তিকরিত যুদ্ধ ২০২
কুফা ও বসরা শহরের গোড়াপত্তন ২০৩
আবারও পারস্যের রণাঙ্গনে ২০৭
আহওয়াজ বিজয় ২০৮
রামাহুরমুজ ও তস্তর বিজয় ২০৯
হুরমুজান মদিনায় ২১১
গুন্দেসাপুর বিজয় ২১৪
নাহাওয়ান্দ বিজয় ২১৫
বীরযোদ্ধা সিংহাসনে বসে থাকতে পারে না ২১৭

বিদায় মহাবীর নুমান ২২০
মূল ইরানে মুসলিম বাহিনী ২২২
ইরান বিজয়সমূহ ২২৩
পুনরায় হামাদান বিজয় ২২৩
রায় বিজয় ২২৫
কুমিস, জুরজান ও তাবারিস্তান বিজয় ২২৫
ইস্পাহান বিজয় ২২৬
আজারবাইজান বিজয় ২২৭
বাব বিজয় ২২৮
খুরাসান বিজয় ২২৯
ইসতাখার বিজয় ২৩৩
দারাবগারদ ও ফাসা বিজয় এবং খলিফার কারামত ২৩৩
কেরমান ও সিজিস্তান বিজয় ২৩৪
মাকরান বিজয় ২৩৪
কুর্দিবিরোধী অভিযান ২৩৫
বিদায় মহানায়ক উমর ২৩৬

আহনাফ ইবনু কায়েস রা.
পারস্য বিজয়ে যার অবদান অবিস্মরণীয়-২৪০

উমরের অবর্তমানে ২৪১
আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া বিজয় ২৪২
উম্মে আবদুল্লাহ ২৪৩
পারস্য, খুরাসান ও তাবরিস্তান ২৪৫
শেষ হলো ইয়াজদাগরিদ ২৪৬

আদি ইবনে হাতেম রাদিয়াল্লাহু আনহু
থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেন—
এরাই (আমার সাহাবিরা) একদিন
পারস্য সম্রাট কিসরা ইবনে
হুরমুজের ধনভান্ডার জয় করবে।

প্রত্যাশিত অভিযাত্রা

মহান আল্লাহ যুগে যুগে অসংখ্য নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এটিই ছিল বাস্তবতার দাবি। আমাদের প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সুমহান ধারার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ও রাসুল। নবি-রাসুল প্রেরণের সাধারণ উদ্দেশ্য দাওয়াত ও হিদায়াত। তবে এর পাশাপাশি তিনি ছিলেন মানবজাতির জন্য বিশেষ আশীর্বাদ ও উপহার। আল কুরআনের ঘোষণা—

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

> আমি আপনাকে কেবল রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি। [সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ১০৭]

এজন্য নবিজি রহমত ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন সর্বক্ষণ। পৃথিবীর বুকে তিনি শান্তিপূর্ণ একটি পরিবেশ কামনা করতেন। এ কারণে তিনি সবসময়—

শত কষ্টেও ক্রুদ্ধ ও কঠোর হতেন না।

কঠোরতার বিপরীতে কোমল আচরণ করতেন।

অত্যাচারের বিপরীতে ভালোবাসা দিতেন।

গালির পরিবর্তে করতেন সুমধুর ব্যবহার।

তিনি কারো ওপর রাগ হতেন না। আর কষ্ট দেওয়ার কথা তো কল্পনাই করা যায় না। অপরাধীকে ক্ষমা করা ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইতিহাস যার জীবন্ত সাক্ষী। দেখতে চান? চলুন, তাহলে ঘুরে আসি তায়েফ[১] থেকে। নিজ চোখে দেখে আসি তাঁর ঐতিহাসিক ক্ষমার অপূর্ব দৃশ্যাবলি—

---

[১] মক্কা থেকে ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত সবুজ-সতেজ ও শস্য-শ্যামল একটি শহরের নাম তায়েফ। কুরাইশদের পর আরবের সবচেয়ে শক্তিশালী সম্প্রদায় ছিল বনু সাকিফ গোত্র। তারা এ তায়েফেই বাস করতো। (মুজামুল

বিপদ আসে দলবেঁধে। চাচা আবু তালিব[২] ইনতিকাল করেছেন। এর মাত্র তিন, পাঁচ কিংবা আরও কিছুদিন পর, তবে ঐ বছরই ইনতিকাল করেন খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা।[৩] নবিজির প্রাণের প্রিয়তমা। ভীষণভাবে ব্যথিত হলেন তিনি। কাফেররা দেখল, এই তো সুযোগ। মানসিকভাবে শেষ করতে হবে তাঁকে।

যেই ভাবা সেই কাজ। নবিজির সঙ্গে মারাত্মক অশোভনীয় আচরণ শুরু করে দেয় ওরা। আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পায় ওদের হিংস্রতা। এমনকি, কখনও কখনও তাঁর মাথার ওপর মাটি পর্যন্ত ছুড়ে মেরেছে ঐ বদমাশরা। একদিন এমনই একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ধুলোবালিতে মলিন হয়ে যায় নবিজির মাথা ও পবিত্র শরীর।

আরবের কুরাইশ বংশ ছিল ভীষণ শক্তিশালী। তাহলে তাদের পরে কে? হ্যাঁ, তৎকালীন আরবে কুরাইশদের পরে সবচেয়ে শক্তিশালী গোষ্ঠী ছিল তায়েফের বনু সাকিফ গোত্র। নবিজি ভাবলেন, তায়েফবাসী হয়তো মহান আল্লাহর দিকে ফিরবে। এগিয়ে আসবে তাঁর দ্বীনের সাহায্যে।

এ লক্ষ্যে কাজ শুরু করলেন নবিজি। তাঁর পালক পুত্র ও বিশিষ্ট সাহাবি ছিলেন জায়েদ ইবনু হারিসা রাদিয়াল্লাহু আনহু। নবুয়তের দশম বছর ২৬ অথবা ২৭ শাওয়াল নবিজি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলেন তায়েফ সফরে। বনু সাকিফে তিন ব্যক্তি ছিলেন খুবই সম্মানী : আবদে ইয়ালিল, মাসউদ ও হাবিব।

এ তিনজন ছিলেন সহোদর। এদের পিতার নাম আমর ইবনু উমায়ের ইবনু আউফ। তাদের একজন বিবাহ করেন কুরাইশদের বনু জুমাহ গোত্রের এক মহিলাকে। সেই সূত্রে নবিজি তাদের আত্মীয়ও ছিলেন। যাহোক, তায়েফ গিয়ে তিনি এ তিনজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। দাওয়াত দিলেন আল্লাহ তাআলার পথে। দ্বীনের সহযোগিতায় এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানালেন তাদের।

সবকিছুর মালিক আল্লাহ। ইসলামের সুমহান এই দাওয়াত কবুল করলো না ওরা। উলটো তাঁর সঙ্গে করলো খুবই রূঢ় আচরণ। মারাত্মক ধৃষ্টতা দেখালো ইসলামের বিরুদ্ধে। ঐ সময় কিছু গোলাম-বাঁদি ছিল ভীষণ মূর্খ-অসভ্য। ওদেরকে তাঁর পেছনে লেলিয়ে দিল ওরা।

বুলদান শি-হামাবি : ৪/৮-১২) সারাওয়াত পর্বতমালার অন্তর্ভুক্ত হেজাজ পর্বত রেঞ্জের চূড়ায় এ শহরটি সমতলভূমি থেকে ১৮৭৯ মিটার (৬১৩৫ ফুট) উঁচুতে অবস্থিত। একে সরকারের গ্রীষ্মকালীন রাজধানীও বলা হয়।

[২] আবু তালিবের মূল নাম ছিল 'ইমরান'। মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল ৮৫ বছর।—সিরাতুন নবি [আল্লামা শিবলি নুমানি] : ২৪৯; তারিখুল ইসলাম [শাহ আকবার খান নজিবাবাদি] : ১/১২০।

[৩] মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। নবিজির বয়স তখন ৫০ বছর।

—সিরাতে ইবনু হিশাম : ১/৪১৫-১৬; তালকিহু ফুহুমি আহলিল আসার : ০৭; রাহমাতুল্লিল আলামিন [সুলাইমান সালমান মানসুরপুরি] : ২/১৬৪; তারিখুল ইসলাম [শাহ আকবার খান নজিবাবাদি] : ১/১২২।

অসভ্য-মূর্খগুলো ছুটতে লাগলো রাহমাতুল্লিল আলামিনের পেছনে পেছনে। নানা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, চিৎকার-চেঁচামেচি ও শোরগোল করে উদ্ভট পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে লাগলো শয়তানের দল। হতভাগাদের হাততালি, হইহই রইরই, বিকট হাসি ও অট্টনিনাদে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো সারা পথ। এভাবে তাঁর পেছনে জমা হয়ে গেল বহু লোক।

লেলিয়ে দেওয়া পাষণ্ডদের এ দলটি প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নিক্ষেপ করতে লাগলো ইট-পাটকেল। যদ্দরুন তাঁর পা মোবারকের নলা জখম হলো এবং সেখান থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ল। যেই পা এই আসমান-জমিনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সেই পা আল্লাহর শত্রু ও ইসলামের দুশমনদের হাতে আহত, ক্ষত-বিক্ষত। আহ![৪]

একজন আব্দাস

পথে ছিল কুরাইশ বংশের দুই ভাই উতবা ও শায়বার[৫] একটি বাগান। কোনো দিশা না পেয়ে নবিজি ঢুকে পড়লেন ঐ বাগানে। তখন ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল লেলিয়ে দেওয়া ঐ পাষণ্ডগুলো।

উতবার দাস আব্দাস নাসরানি ঐ বাগান দেখাশোনা করতেন। তিনি নবিজিকে আঙুর দিলেন রেকাবি ভরে। নবিজি খুশি হলেন, খাওয়া শুরু করলেন 'বিসমিল্লাহ' বলে। আব্দাস বললেন—

—আপনি যা বললেন, তা তো এদেশের মানুষ বলে না।

—তুমি কোন দেশের লোক?

—আমি খ্রিষ্টান। আমার বাড়ি নিনুয়া[৬]

—তাহলে তুমি তো আমার ভাই ইউনুস আলাইহিস সালামের দেশের লোক।

—আপনি তা কীভাবে জানলেন?

—তিনিও নবি ছিলেন। সুতরাং তিনি আমার ভাই।

এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আব্দাস ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত-পা ও শির মোবারকে চুমু খেলেন। বাগানের মালিক উতবা তাঁকে জিজ্ঞেস করলো—

---

[৪] সিরাতে ইবনু হিশাম : ১/৪১৯; জাদুল মাআদ : ২/৪৬; সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ : ২/৫৭৬; সিরাতুন নবি [আল্লামা শিবলি নুমানি] : ২৫০; তারিখুল ইসলাম [শাহ আকবর খান নজিবাবাদি] : ১/১২২।

[৫] উতবা ও শায়বার পিতার নাম রবিয়া। কাফির হলেও এরা উদার মনের ছিলেন। বদর যুদ্ধে উতবা হামজা ও শায়বা আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাতে নিহত হয়।

[৬] নিনুয়া বর্তমান ইরাকের মসুল শহরের নিকটে অবস্থিত।

তুমি এমনটি করলে কেন?

আদ্দাস রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন—

বর্তমান যুগে সমগ্র বিশ্বে তাঁর চেয়ে ভালো আর কোনো মানুষ নেই। আপনারা তাঁর মর্যাদার ব্যাপারে অবগত নন। নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহর নবি।[৭]

তায়েফের এ ঘটনাটি ছিল প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের সবচেয়ে কঠিনতম বিপদ। অবসন্ন দেহের কম্পিত হাত তখন উঠে গেল মহামহিমের দরবারে। ব্যথিত হৃদয় থেকে তখন বেরিয়ে এলো করুণ সুর। অত্যন্ত মিনতিভরে তিনি মহান আল্লাহর দরবারে দুআ করলেন—

হে আল্লাহ, একমাত্র তুমিই আমার মালিক। তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই। তুমি আমাকে কাদের হাতে সমর্পণ করছো? যারা আমাকে রুক্ষ ও কর্কশ ভাষায় জর্জরিত করছে? তবে তুমি যদি আমার ওপর অসন্তুষ্ট না হয়ে থাকো, তাহলে (এসব বিপদাপদে) আমার কোনো পরোয়া নেই। তোমার সন্তুষ্টিই আমার একমাত্র সম্বল। তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তোমার দরবারে ফরিয়াদ করছি।

হে আল্লাহ! তুমি শক্তি না দিলে সৎকাজ করা এবং পাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকার কোনো উপায় নেই।'[৮]

দুআর পর আল্লাহ তাআলা প্রিয়বন্ধুর খিদমতে 'মালাকুল জিবাল'কে (পাহাড়ের অধিকর্তা ফেরেশতা) প্রেরণ করলেন। ফেরেশতা এসে বললেন—

ذَلِكَ فِيمَا شِئْتَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الأَخْشَبَيْنِ؟

এ ব্যাপারে আপনার আদেশ কী? আপনি যদি চান, তাহলে আখশাবাইন পাহাড় দুটিকে চাপা দেবো (ওদের পিষে ফেলবো)।

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ، لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا .

---

[৭] সিরাতে ইবনু হিশাম : ১/৪১৯; জাদুল মাআদ : ২/৪৬; মুখতাসার সিরাতুর-রাসুল : ১৪১; রাহমাতুল্লিল আলামিন [সালমান সুলায়মান মনসুরপুরি] : ১/৭১।

[৮] তারিখুল উমাম ওয়াল মুলক : ২/২৩০; আস-সিরাতুল হালাবিয়্যা : ১/৩৫৪।

(না, তা হয় না;) বরং আমি চাই, (এরা বেঁচে থাকুক।) মহান আল্লাহ এদের থেকে এমন লোক সৃষ্টি করে দেবেন, যাঁরা এক আল্লাহর ইবাদত করবে। তাঁর সঙ্গে অন্য কোনো কিছুকে শরিক করবে না।[৯]

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগ সংবরণ করেছেন, এর হাজারও প্রমাণ আমরা পাই হাদিস শরিফে। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

'একবার প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে সাহাবিদের সঙ্গে নিয়ে বসেছিলেন। তখন জনৈক বেদুইন এসে মসজিদের মধ্যে পেশাব করতে লাগলো। সাহাবায়ে কিরাম তাকে বারণ করে বলতে লাগলেন, 'থামো, থামো'। এ কথা শুনে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

لا تزرموه دعوه، ثم دعاه، فقال : إن هذا المسجد لا يصلح لشيء من القذر والبول - إنما هو لقراءة القرآن، وذكر الله، والصلاة.

তাকে বাধা দিয়ো না, পেশাব করতে দাও। এর পর লোকটিকে ডেকে বললেন, দেখো, এই মসজিদগুলো পেশাব-পায়খানা বা ময়লা-আবর্জনা ফেলার জায়গা নয়। এগুলো পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত, আল্লাহর জিকির ও নামাজ আদায়ের জায়গা।[১০]

শুধু এতটুকু বলেই ছেড়ে দিলেন। আর কিছু বললেন না। আমরা দেখতে পেলাম অপূর্ব ক্ষমার একটি দৃশ্য।

উহুদ যুদ্ধে প্রথমদিকে মুসলিমদের পাল্লাই ভারী ছিল। এর পর ভুল বোঝাবুঝির কারণে তাদের ওপর নেমে আসে আকস্মিক বিপদ। এ সময় কাফেররা বলতে থাকে—'এই তো সুযোগ। এবার মুহাম্মাদকে হত্যা করতে না পারলে, আর তাঁকে কিছু করা যাবে না। এজন্য ওরা বারবার তাঁর ওপর আক্রমণ করতে থাকে। নবিজি তাদের আক্রমণ ঠেকিয়ে আত্মরক্ষা করে যান।'

এসময় প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর তির, তরবারি ও বর্শার আঘাত আসতে থাকে চারদিক থেকে। এ যেন আঘাতের বৃষ্টি। তিনি বললেন—

কে আছো, আমার জন্য জীবন দিতে পারবে?

তখন জিয়াদ ইবনুস সাকান রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি আছি। এই বলে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন শত্রুর ওপর। তাঁর সঙ্গে আরো পাঁচজন (মতান্তরে ছয়জন) আনসার

[৯] সহিহুল বুখারি, হাদিস নং : ৩২৩১ (১/৪৫৮); সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ১৭৯৫ (২/১০৯)।
[১০] সহিহ ইবনু খুযাইমা, হাদিস নং : ২৯৩।

সাহাবি লড়াই করতে লাগলেন। তাঁরা নবিজির সামনেই জীবন বিলিয়ে দিয়ে জান্নাতের পথে রওনা হলেন।[১১] নবিজির পা মোবারকের ওপর শহিদ হন জিয়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু।

তির, তরবারি ও বর্শার আঘাত বৃষ্টির মতো আসতে থাকে চারদিক থেকে। তখন আবু দুজানা রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের পিঠকে নবিজির জন্য ঢাল বানিয়ে দেন। সব আঘাত নিজের পিঠে নিতে থাকেন। এতে তাঁর পিঠ চালুনির মতো ঝাঁজরা হয়ে যায়। তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের হাত দিয়ে তির, তরবারি ও বর্শার আঘাত ঠেকাতে থাকেন। এতে তাঁর একটি হাত কেটে পড়ে যায়।

আবু তালহা আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন বিখ্যাত তিরন্দাজ। তিনি কাফেরদের ওপর বৃষ্টির মতো তির নিক্ষেপ করতে থাকেন। ভেঙে যায় তার অনেকগুলো ধনুক। একটি ঢাল ধরে তিনি নবিজিকে রক্ষা করার চেষ্টা করছিলেন। নবিজি মাথা বের করলে তিনি বলেন—

হে আল্লাহর রাসুল! আপনি মাথা বের করবেন না। তির আমার বুকে লাগুক। আপনি সুস্থ থাকুন।

সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু নবিজির কাছে বসে তির ছুড়তে থাকেন। তিনি বলেন—

يا سعد ارم فداك أبي وأمي

> সাদ! তুমি তির ছুড়তে থাকো। আমার পিতামাতা তোমার প্রতি কুরবান হোক।[১২]

এরপরও রক্ষা হলো না। কাফেরদের নামকরা এক বীরের নাম ছিল আবদুল্লাহ ইবনু কামআ। সে ভিড় ঠেলে চলে আসে নবিজির কাছে। তরবারি দিয়ে আঘাত করে নবিজির মুখে। লোহার দুটি কড়া ঢুকে যায় তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডলে। নবিজির নিচের পাটির সামনের ডান পাশের একটি দাঁত ভেঙে যায় উতবা ইবনু ওয়াক্কাসের আঘাতে। রহমতের নবির শরীর থেকে রক্ত ঝরতে থাকে।[১৩]

কাফেরদের এমন নির্মম ব্যবহার ও নিষ্ঠুর আঘাত দেখে রহমতের নবি ভয় পেয়ে যান। কারণ, এর জন্য হয়তো তাদের ওপর আল্লাহর গজব নাজিল হতে পারে। অস্থির হয়ে তিনি দুআ করেন রাব্বুল আলামিনের কাছে—

---

[১১] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ৩১৪৯।
[১২] সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ৪০৫৯।
[১৩] সিরাতুন নবি [আল্লামা শিবলি নুমানি] : ৩৭৯-৩৮০।

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ

হে আল্লাহ! আমার জাতিকে ক্ষমা করে দিন। কারণ, তারা জানে না।[১৪]

কিন্তু আজ প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীষণ রাগ হয়েছেন। এমনকি অভিশাপও দিয়ে ফেলেছেন তিনি। অথচ এ এমন একসময়, যখন নবিজির খুশি থাকার কথা। অসন্তুষ্ট হওয়ার কথা নয় কোনোভাবেই। কারণ, হুদাইবিয়া থেকে ফিরে আসার সময় স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাঁকে সুসংবাদ দিয়েছেন। নাজিল হয়েছে পবিত্র আয়াতে কারিমা—

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا .

নিশ্চয় আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি, যাতে আল্লাহ আপনার অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রুটিসমূহ মার্জনা করে দেন। আপনার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন। আপনাকে সহজ-সরল পথে পরিচালিত করেন এবং আপনাকে দান করেন বলিষ্ঠ সাহায্য। [সুরা আল-ফাতাহ, আয়াত : ১-৩]

মহান আল্লাহ যখন হুদায়বিয়ার এই সন্ধিকে সুস্পষ্ট বিজয় বলে ঘোষণা দেন, তখন সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন—

হে আল্লাহর রাসুল! এটি কি আমাদের বিজয়?

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন—

হ্যাঁ, এটি আমাদের জন্য মহাবিজয়।

আসলেই এ সন্ধিচুক্তিটি ইসলামের ব্যাপক প্রচার-প্রসার ও ইসলামের সর্বব্যাপী বিজয়ের মূলভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। সাহাবায়ে কিরাম এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, হুদায়বিয়ার সন্ধি ছিল মহাবিজয় এবং আল্লাহ তাআলার গৌরবময় অনুগ্রহ। কারণ, এ সন্ধি উন্মোচন করে দিয়েছিল মক্কা বিজয়ের দ্বার। এ সন্ধিচুক্তিই প্রমাণিত হয়েছিল ইসলামের দিগন্ত বিস্তৃত প্রচার-প্রসারের একটি বিশেষ উপকরণ হিসেবে।

---

[১৪] সহিহুল বুখারি, হাদিস নং : ৩৪৭৭।

ইসলাম সমগ্র বিশ্বে প্রতিষ্ঠা করেছিল উন্নত আদর্শের ভিত্তি। একমাত্র ইসলাম ধর্মের কারণেই সাহাবায়ে কিরাম উত্তম চারিত্রিক গুণাবলির শীর্ষচূড়ায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। কুরাইশ ও অন্যান্য শত্রুভাবাপন্ন গোত্রসমূহ ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে তেমন কিছু জানতে পারেনি। কারণ, সবসময় ঝগড়া-বিবাদ ও যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকার ফলে তারা ধীর-স্থিরভাবে ইসলামের সু-উজ্জ্বল শিক্ষা সম্পর্কে তেমন কোনো সঠিক ধারণা নিতে পারতো না।

বিজয় অর্জন করে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হুদায়বিয়া থেকে ফিরছিলেন, তখন আরও নাজিল হয়—

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا .

আল্লাহ ঈমানদারদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তাঁরা গাছের নিচে আপনার হাতে বাইআত করেছে। আল্লাহ অবগত ছিলেন, যা তাদের মনের মধ্যে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের ওপর প্রশান্তি নাজিল করেছেন এবং তাদেরকে অত্যাসন্ন বিজয় (এর সুসংবাদ) দান করেছেন। আর অনেক গনিমতের মাল দান করেছেন, যা তারা অচিরেই হস্তগত করবে। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও সর্বোত্তম কুশলী। [সুরা আল-ফাতহ, আয়াত : ১৮-১৯]

এ আয়াতে কারিমায় মহাবিজয় ও পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে। পরবর্তীকালে পুরস্কার হিসেবে আল্লাহ তাআলা তাঁদের দুটি জিনিস দান করেছেন—

১. যুদ্ধলব্ধ বিপুল সম্পদ।

২. অত্যাসন্ন বিজয়।

এটি ছিল খায়বার[১৫] বিজয়ের পূর্বাভাস। খায়বার বিজয়ের মাধ্যমে এ দুটি বিষয় ভালোভাবেই আয়ত্তে এসেছিল।

এত কিছুর পরও প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারাত্মক ক্রুদ্ধ। ভীষণ রাগান্বিত তিনি।

---

[১৫] **খায়বার :** মদিনা থেকে উত্তর পশ্চিম কোনে ১৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত একটি অঞ্চলের নাম। এ স্থানটি ছিল খুবই উর্বর ও সবুজ-শ্যামল। বনু নাজির গোত্রের ইহুদিরা মদিনা থেকে বিতাড়িত হয়ে এখানে এসে অবস্থান গ্রহণ করেছিল। এখানে বসেই তারা করছিল ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের ষড়যন্ত্র। তারা নিজেদের নিরাপত্তার জন্য এখানে শক্তিশালী অনেকগুলো দুর্গ স্থাপন করেছিল।

কেন এত রাগ তাঁর?

অথচ তিনি হলেন রাহমাতুল্লিল আলামিন। সমগ্র বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব। সুতরাং বিনা কারণে তিনি রাগতে পারেন না। তাহলে আমরা চলে যাবো কারণ খুঁজতে। আমরা এখন ষষ্ঠ হিজরির পবিত্র মদিনাতুর রাসুলে।

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হয়েছিলেন সমগ্র বিশ্বের জন্য। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বার্তা বহনকারী রাসুল ও বিশ্ব মানবতার জন্য রহমতের মূর্ত প্রতীকরূপে। সুতরাং তাঁকে সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি মানুষের কাছেই মহাসত্যের আহ্বান পৌঁছাতে হবে। সঠিক ও সুন্দরভাবে। অবশ্য সবার কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার দায়িত্ব আল্লাহ তাআলার।

দৃষ্টি জগ্রোস পর্বতমালায়

সুতরাং স্বস্তি নেই প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনে। দৃষ্টি চষে বেড়াচ্ছে পারস্য উপসাগরের উপকূল ঘেঁষে। যার উত্তর-পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পূর্ব কোণ বরাবর সগৌরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে জগ্রোস পর্বতমালা।[১৬] এই পর্বতমালার পাদদেশ থেকে পূর্ব দিকে ভারতীয় প্লেট পর্যন্ত বিস্তৃত ইরানি মালভূমি। ভৌগোলিকভাবে ত্রিকোণাকৃতির এই অঞ্চল ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত পরিচিত ছিল পারস্য নামে, যা আজকের দিনে পরিচিতি লাভ করেছে ইরান নামে। এই অঞ্চলেই তখন প্রতিষ্ঠিত ছিল ইতিহাস বিখ্যাত পারস্য সাম্রাজ্য।

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মন এদিকে আটকে থাকার কারণ অনেক। যেমন—

- পৃথিবীর ইতিহাসে আজ পর্যন্ত যতগুলো বৃহৎ এবং প্রভাবশালী সাম্রাজ্যের নাম পাওয়া যায়, এর মধ্যে পারস্য সাম্রাজ্যের নাম একদম উপরের দিকেই রাখা হয়।
- এ সাম্রাজ্যই পৃথিবীর প্রথম পরাশক্তি।

---

[১৬] **জগ্রোস পর্বতমালা :** পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম ইরানের একটি পর্বতমালা। উপত্যকা ও সমভূমি দ্বারা বিচ্ছিন্ন অনেকগুলি সমান্তরাল পর্বতশ্রেণি নিয়ে গঠিত এই পর্বতমালার অনেকগুলি পর্বত। ৩০০০ মিটারেরও বেশি উঁচু। কিছু কিছু পর্বতশৃঙ্গ সবসময় তুষারাবৃত থাকে। এদের মধ্যে সর্বোচ্চ শৃঙ্গটির নাম জার্দ কুহ, যার উচ্চতা ৪,৫৪৭ মিটার। দেনা ২য় সর্বোচ্চ পর্বত (উচ্চতা ৪,৩৫৯ মিটার)। পর্বতমালার অভ্যন্তরে অনেক উর্বর উপত্যকা অবস্থিত এবং এগুলিতে কৃষি ও পশুপালন জীবিকা উপার্জনের অন্যতম উপায়। জগ্রোস পর্বতমালাটি প্রায় ১,৫০০ কিলোমিটার দীর্ঘ। এটি ইরানের উত্তর-পশ্চিমে শুরু হয়ে মোটামুটি ইরানের পশ্চিম সীমান্ত ধরে ইরানীয় মালভূমির সমগ্র পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম দৈর্ঘ্য বরাবর প্রসারিত হয়েছে এবং হরমুজ প্রণালিতে এসে শেষ হয়েছে। কের্মান প্রদেশের হাজির নামের স্তূপ পর্বতমালা এবং জাবাল বারেজ পর্বতশ্রেণি জাগ্রোসের পূর্ব সীমানা নির্ধারণ করেছে।

- ভৌগোলিক অবস্থান, উন্নত শাসনব্যবস্থা, শিল্প-সংস্কৃতি, স্থাপত্যকলা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি প্রভৃতি বিষয়ের কোনো কিছুরই অভাব ছিল না এখানে!

কিন্তু মানবতাহীন বিশ্বে সবকিছুই ছিল নিঃশেষ হওয়ার পথে।

মহান আল্লাহ প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেবল আরব ভূখণ্ডের জন্যই প্রেরণ করেননি; বরং বিশ্বজয়ের লক্ষ্য নির্ধারণ করে প্রেরণ করেছিলেন তাঁকে। তাঁর টার্গেটের বিষয় উল্লেখ করতে গিয়ে ইরশাদ হচ্ছে :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

আমি তো আপনাকে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি। [সুরা সাবা, আয়াত : ২৮।]

সুতরাং এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক মহাপরিকল্পনা হাতে নিতে হবে। তাছাড়া প্রথম থেকেই মক্কার মুশরিক, কুরাইশ কাফের ও অন্যান্য আরব গোত্রসমূহের উৎপাত ছিল মারাত্মক। ফলে এতদিন তিনি এদের অত্যাচার ও তার প্রতিরোধ কাজে মনোসংযোগ নিবদ্ধ রেখেছিলেন। কাজেই আরবের বাইরে খেয়াল করার সুযোগ পাননি; কিন্তু যখন কুরাইশদের সঙ্গে হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন হলো, তখন তিনি অনেকটা স্বস্তি লাভ করলেন।

আল্লাহ তাআলা এ সন্ধিকে প্রকাশ্য বিজয় বলে ঘোষণা করেছেন। এই প্রকাশ্য বিজয়ের এটিও অন্যতম একটি অর্থ। এতে সুগভীর হলো নবিজির আশ্বস্তি। তিনি বুঝতে পারলেন, দীর্ঘ সাধনার সাফল্য প্রাপ্তির সময় নিকটবর্তী। এখন আরবের বাইরে দ্বীন ইসলাম প্রচারের সময় হয়েছে।

ষষ্ঠ হিজরির জিলহজ মাসে নবিজি হুদাইবিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। এ মাসেই সংঘটিত হয় গাবা অভিযান। এ অভিযানের তিন দিন পর সপ্তম হিজরির প্রারম্ভে তিনি খায়বার যুদ্ধে যাত্রা করেন। খুব সম্ভব যে তিন দিন তিনি মদিনায় ছিলেন, এর কোনো একদিনেই তিনি বহির্বিশ্বে দূত প্রেরণ করতে মনস্থ করেন।

কিন্তু এ কাজ মোটেও সহজ ছিল না তাঁর জন্য। এর সুবিধা-অসুবিধার দিকগুলো সম্পর্কে অবহিত ছিলেন তিনি। যেমন :

- যে দেশে দূত প্রেরণ করা হবে সেখানকার ভাষা, সংস্কৃতি ও মানুষ সম্পর্কে দূতেরা অজ্ঞ।
- সেখানে গিয়ে তারা রাজা-বাদশাহকে তাদের পৈত্রিক ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেবেন।

সুতরাং এটি নিঃসন্দেহ যে, এই দৌত্যকার্য ছিল মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। সেখানে যারা যাবে, তারা হয়তো আর কোনোদিন ফিরে আসতে নাও পারে।

তাই একদিন প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমকে সমবেত করলেন। হামদ ও সানার পর পাঠ করলেন কালিমায়ে শাহাদত। এরপর বললেন—

'আমি সমগ্র বিশ্বের জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাঁর বার্তা বাহক-রাসুল ও রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছি। দেখো, আমি তোমাদের কিছু লোককে আজমি বা অনারব বাদশাদের কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তোমরা ঈসা আলাইহিস সালামের সৈন্যদের মতো মতবিরোধে লিপ্ত হয়ো না। যাও, আমার পক্ষ থেকে তোমরা সত্যের আহ্বান ছড়িয়ে দাও।'

সাহাবায়ে কিরাম জবাব দিলেন—

'ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমরা আপনার ইচ্ছা পূরণ করবো। যেখানে ইচ্ছা, আপনি আমাদের পাঠিয়ে দিন।'

ইসলামের বিজয় সুনিশ্চিত—একথা প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভালো করেই জানতেন। তাই সত্যের আহ্বান ছড়িয়ে দেওয়ার মানসে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। মহাসত্যের যে অমূল্য সওগাত নিয়ে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন, তা সীমাবদ্ধ থাকার জন্য নয়; বরং তা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার জন্য। বিষয়টি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে লাগলেন তিনি।[১৭]

আশ্বস্ত হয়ে বিশ্রাম নেবেন, এমন একটি মুহূর্ত নেই প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে। এ শ্রেষ্ঠ উপহার তাঁকে জনে জনে পৌঁছে দিতে হবে। একে পরিবেশন করতে হবে সৃষ্টির প্রতিটি সদস্যের সামনে। তাই তিনি সাদর আহ্বান-লিপি দিকে দিকে পাঠিয়ে দিতে মনস্থ করলেন।

তৎকালীন বিশ্বে প্রসিদ্ধ রাজশক্তি ছিল ছয়টি :

১. ইউরোপে রোম সাম্রাজ্য (The Holy Roman Empire)।

২. এশিয়ার পারস্য সাম্রাজ্য।

৩. আফ্রিকার হাবশা সাম্রাজ্য।

---

[১৭] সিরাতুন নবি [আল্লামা শিবলি নুমানি] : ৪৬২।

৪. মিশরের আজিজ মুকাওকিস।[১৮]

৫. ইয়ামামার সরদার এবং

৬. সিরিয়ার গাসসানি শাসনকর্তাও ছিল বেশ প্রভাবশালী।[১৯]

তাই প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদের সবার কাছে একই দিনে, একই সময়ে ইসলামের আহ্বানপত্রসহ ছয়জন দূত প্রেরণ করেন। এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্য যে ছয়জন মহান ব্যক্তি দূত হিসেবে প্রেরিত হন, তাঁরা হলেন—

১. দিহইয়া কালবি রাদিয়াল্লাহু আনহু	:	রোম সম্রাট কায়সার।
২. আবদুল্লাহ ইবনু হুজাফাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু	:	পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজ।
৩. হাতিব ইবনু আবি বালতাআ রাদিয়াল্লাহু আনহু	:	আজিজ মিসর।
৪. আমর ইবনু উমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু	:	হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশি।
৫. সালিত ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু	:	ইয়ামামার সরদারগণ।
৬. শুজা ইবনু ওহাব রাদিয়াল্লাহু আনহু	:	গাসসানি শাসক হারিস।[২০]

অজানার পথে

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রখ্যাত সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনু হুজাফাহ আস সাহমি আল কুরাইশি রাদিয়াল্লাহু আনহু। সাহসী ও বীরযোদ্ধা হিসেবে তার খ্যাতি ছিল আরবজুড়ে। চালাক হিসেবেও পরিচিত ছিলেন সর্বমহলে। প্রাথমিক যুগেই ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেন তিনি।

আবদুল্লাহ ইবনু হুজাফার দাদার নাম কায়স ইবনু আদিইয়্যা। তার মাতা ছিলেন হারসানের কন্যা, ইনি ছিলেন বানুল হারিস ইবনু আবদ মানাত গোত্রের লোক। আবু হুজাফাহ তার ডাকনাম বা উপনাম (কুনিয়াত)। তিনি দুবার হিজরতের সৌভাগ্য অর্জনকারী সাহাবি। কারণ, ভাই কায়স ইবনু হুজাফাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়ে দ্বিতীয় কাফেলার সঙ্গে প্রথমে তিনি হাবশায় হিজরত করেন। এরপর হিজরত করেন পবিত্র শহর মদিনাতুর রাসুলে।

---

[১৮] মিসরের শাসনকর্তা মুকাওকিস রোম সম্রাটের অধীনে ছিলেন; কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী ও প্রভাবশালী। এজন্য তাকে স্বাধীন শাসকের মতোই মনে করা হতো।

[১৯] সিরাতুন নবি [আল্লামা শিবলি নুমানি] : ৪৬৩।

[২০] ফাতহুল বারি : ১/১৩১; সিরাতুন নবি [আল্লামা শিবলি নুমানি] : ৪৬৪।

তাঁর আরেক ভাই খুনায়স ইবনু হুজাফাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর কন্যা উম্মুল মুমিনিন হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহার পূর্বতন স্বামী। একমাত্র বদর যুদ্ধ ছাড়া তিনি সব যুদ্ধেই প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন।

আবদুল্লাহ ইবনু হুজাফাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু পারস্য সম্রাটের কাছে একটি পত্র নিয়ে যাবেন। এ পত্র প্রেরিত হয়েছে বিশ্বমানবতার মহান নেতা প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে। এজন্য তিনি সফরের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করলেন। বাহন ঠিকঠাক করলেন চলার জন্য। অন্যান্য পাথেয় নিয়ে নিলেন প্রয়োজন মতো। সবশেষে বিদায় নিলেন স্ত্রী-সন্তান ও পরিবার-পরিজন থেকে। তিনি বের হলেন—

অজানার পথে...

আল্লাহ তাআলার রাস্তায়...

পথ ভীষণ কঠিন। বহু চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে আপন গন্তব্যের দিকে অবিরাম ছুটে চলেছেন আবদুল্লাহ ইবনু হুজাফাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু। মারাত্মক উঁচু-নিচু ভূমি। বিচিত্র এক পথ ধরে এগিয়ে চলেছেন তিনি। দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা এবং অসহ্য যন্ত্রণা। এ পথে আছে সবই। তারপরও এই কঠিন থেকে কঠিনতম, ভয়াবহ থেকে ভয়াবহ, মারাত্মক হতে আরো মারাত্মক সফরে ক্লান্তিহীন পথে ছুটে চলছেন তিনি। দুর্বার গতিতে।

বিচিত্র পথের ভয়ানক এ সফর। আবদুল্লাহ ইবনু হুজাফাহ একাকী চলছেন এ সফরে। তিনি তো সম্পূর্ণ একা। না, তিনি একা নন। আরো একজন আছেন তাঁর সঙ্গে। যিনি তাঁকে দেখছেন। পর্যবেক্ষণ করছেন তাঁর সব কর্মকাণ্ড।

কে তিনি?

তিনি হলেন মহান আল্লাহ। রাব্বুল আলামিন। আমাদের সৃষ্টিকর্তা। আমাদের লালন-পালনকারী। আমাদের ভালা-মন্দ সবকিছুর নিয়ন্ত্রণকারী। আল্লাহ তাআলা হয়তো তাঁর বান্দার এ কষ্ট দেখে মুচকি হাসছেন। হয়তো তাঁর আশেপাশের ফেরেশতাদের লক্ষ করে টিপ্পনী কেটে বলছেন—'কী হে ফেরেশতারা! আমার এ বান্দাকে দেখছো? কীভাবে আমার দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে! মৃত্যুর কোনো পরোয়া করছে না। কোনো বাধাই তাঁকে দমাতে পারছে না। সে এগিয়ে চলছে তো চলছেই। সামনের দিকে, শুধুই সামনের দিকে। কারণ, সে নিশ্চিত জানে—

এ পথ আল্লাহর পথ।

এ পথেই আছে সবার মুক্তি।

এ পথে আছে বিজয়। সুনিশ্চিত বিজয়।

ফেরেশতারা হয়তো নিজেদের অক্ষমতার কথা স্বীকার করে বলছে—

'হে মহামহিম! আপনি যা জানেন, আমরা তা জানি না। আমরা অপারগ। আমরা ভীষণ অক্ষম।'

পারস্যের রাজদরবারে

আবদুল্লাহ ইবনু হুজাফাহ সুদীর্ঘ ও ভয়াবহ পথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছে গেলেন পারস্যে। ভয়ভীতি তাঁর চারপাশে জড়ো হয়ে আছে। তবে তিনি আল্লাহর সৈনিক। তাঁর সামনে ও পেছনে জ্বলছে কুফরির আগুন; কিন্তু তিনি প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্রবাহক। এজন্য ভেঙে পড়ছেন না কিছুতেই। এগিয়ে চলছেন। সামনের দিকে।

খুব ভালো করেই জানেন তিনি, এ পথে বিজয় সুনিশ্চিত।

আল্লাহর দ্বীনের পবিত্র বাণী বহন করতে গিয়ে যদি তাঁকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়, তাহলে এটি হবে তাঁর জন্য পরম সৌভাগ্যের বিষয়। এ বিশ্বাস নিয়েই তিনি সমস্ত আপনজন ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন হাবশায়। এরপর চলে এসেছেন মদিনায়। পালন করে যাচ্ছেন মহান আল্লাহর প্রতিটি নির্দেশ ও তাঁর রাসুলের প্রতিটি হুকুম।

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান হুকুম পালন করতে এখন তিনি উপস্থিত হয়েছেন ইরানের রাজদরবারে। পারস্য সম্রাটের শ্বেতপ্রাসাদে। কিসরার সামনে। এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি হয়েছেন তিনি। তবে মনে কোনো ভয় নেই, আছে শুধু আল্লাহর রহমতের প্রবল আশা-আকাঙ্ক্ষা।

পারস্য সম্রাটের উপাধি ছিল কিসরা। সেকালে কিসরা ছিলেন খসরু পারভেজ। তিনি ছিলেন ভীষণ অহংকারী ও উদ্ধত স্বভাবের লোক। এ কিসরার আমলে রাজদরবার ছিল ভীষণ আড়ম্বরপূর্ণ। ইতিপূর্বে কখনো এমনটি ছিল না। মাত্র কিছুদিন আগেও তিনি রোমানদের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছেন; কিন্তু এর পরও স্বভাবে ও জৌলুসে কোনো পরিবর্তন হয়নি।

আবদুল্লাহ ইবনু হুজাফাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু পারস্য সম্রাটের জন্য প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি পত্র নিয়ে এসেছেন। একথা তিনি সম্রাটের পরিষদবর্গকে জানালেন। সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করলেন পত্রটি পৌঁছে দিতে। পত্রবাহকের আগমন এবং তাঁর উদ্দেশ্যের বিষয়টি সম্রাটের কানে গেল যথাসময়ে। দরবার সুসজ্জিত করার আদেশ দিলেন তিনি। পরিষদবর্গ দ্রুত রাজদরবার সাজিয়ে ফেলল অপূর্ব সাজে। পরের দিন দরবারে ডেকে আনা হলো পারস্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে।

জাঁকজমকপূর্ণ দরবারে উপস্থিত পারস্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। তাদের মাঝে সম্রাটের সামনে ডাক পড়ল আরব পত্রবাহকের। আবদুল্লাহ ইবনু হুজাফাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু উভয় জাহানের সম্রাট, বিশ্বমানবতার মুক্তির দিশারি প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্রের বাহক। একটি পাতলা শামলাহ (শরীরে পেঁচানো হয় যে চাদর) ও একটি মোটা 'আবা' (লম্বা কোর্তা) গায়ে জড়িয়ে একজন সাধারণ বেদুইনবেশে হাজির হলেন কিসরার রাজদরবারে।

আবদুল্লাহ ইবনু হুজাফাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন সুদর্শন পুরুষ। বেশ লম্বা-চওড়া ও সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন তিনি। এর সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছিলেন—

ইসলামের গরিমায় গর্বিত।

ঈমানের বলে বলীয়ান।

ইশকে রাসুলের তেজে তেজীয়ান।

জ্যোতিষ্মান ছিলেন কুরআনের জ্যোতিতে।

মহান আল্লাহর আদেশ পালন করতে পারার আবেগে উজ্জীবিত এবং

রাসুল-প্রেমের আগুনে দীপ্যমান এক সাহসী পুরুষ।

অতি সাধারণ পোশাকের একজন আরব বেদুইনকে রাজদরবারে প্রবেশ করতে দেখলেন সম্রাট। অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন তিনি। ভড়কেও গেলেন কিছুটা। এজন্য তাঁর হাত থেকে পত্রটি নিয়ে নেওয়ার আদেশ দিলেন পরিষদবর্গের একজনকে।

এগিয়ে এসে পত্র চাইল লোকটি। না, পত্রবাহক আবদুল্লাহ ইবনু হুজাফাহ পত্রটি তার হাতে দিলেন না। মুখের ওপর সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করলেন—

'প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পত্রটি সরাসরি সম্রাটের হাতে দিতে বলেছেন। সুতরাং আমি সে আদেশের বিপরীত কিছু করতে পারি না।'

পারস্য ও কিসরা

বিশাল ক্ষমতাধর কিসরা খসরু পারভেজ। আরব পত্রবাহকের জবাবে বিস্মিত হলেন তিনি। তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর পরাশক্তির অধিকর্তা কিসরা পারভেজ। তার সাম্রাজ্যের নাম পারস্য, পারসিস অথবা পারসিয়া। পারস্য শব্দটি ইউনানি রোমান উপাধি পারসি (Parsae) হতে উদ্ভূত। কারণ, এ সাম্রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিমে পারসেস নামক একটি গোষ্ঠী বসবাস করত। এ গোষ্ঠীর নামানুসারেই এর নামকরণ করা হয়।

আর ইরান শব্দটি আরিয়ানা (Aryana) হতে উদ্ভূত। এর অর্থ আরায়িদের আবাসভূমি। ইরান ছিল সাসানি রাজ বংশের রাজধানী। যারা নিজেদের 'শাহানশাহে ইরান ওয়া আনিরান' উপাধিতে ভূষিত করত। 'শাহানশাহে ইরান ওয়া আনিরান'-এর প্রশাসনিক নাম ছিল কিসরা। কিসরা পারভেজ তার লোকদের আদেশ দিলেন—

'তাকে আমার কাছেই আসতে দাও।'

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র নিয়ে এগিয়ে গেলেন আবদুল্লাহ ইবনু হুজাফাহ। বীরদর্পে দাঁড়িয়ে গেলেন পারস্য সম্রাটের সামনে। নির্ভীকচিত্তে পবিত্র পত্রখানা অর্পণ করলেন সম্রাটের হাতে। এতে একটুও কাঁপল না তাঁর হাত। রাজদরবারের কর্মচারীরা তখন বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আরবের এই বেদুইন লোকটির দিকে। তাদের নির্বাক দৃষ্টি আটকে রইল রাসুলে আরাবির এই বীর সাহাবির প্রতি। তাঁর দুঃসাহসিক কাজ বিস্মিত করল সবাইকে।

সম্রাট ইরানের লোক, তাঁর মাতৃভাষা ফারসি। আরবি জানেন না। তাই আরবিভাষী হিরার অধিবাসী একজন সচিবকে ডেকে আনলেন। পত্র পাঠ করতে বললেন তাকে। কিসরার হাত থেকে পত্রটি গ্রহণ করে খুলল। কিছুক্ষণ নীরব থেকে পড়তে আরম্ভ করল দোভাষী লোকটি। উভয় জাহানের সর্দার মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লিখেছেন—

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى كسرى عظيم فارس سلام الله على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله، وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك بداعية الله - عز وجل - فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة، لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت، فإن إثم المجوس عليك .

সতত দয়াবান পরম করুণাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি।

আল্লাহ তাআলার রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে পারস্য সম্রাটের প্রতি।

শান্তি বর্ষিত হোক তার ওপর, যে সত্যের অনুসরণ করে, আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং এ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো মাবুদ (উপাস্য) নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তাঁর প্রেরিত রাসুল।

আমি আপনাকে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দিচ্ছি। আমি সব মানুষের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছি। যাতে তাদের সবাইকে জাহান্নাম থেকে সতর্ক করতে পারি এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে দলিল হতে পারি। আপনি ইসলামধর্ম গ্রহণ করুন, তাহলে নিরাপদে থাকবেন। আর যদি আপনি এটাকে অস্বীকার করেন, তাহলে সমস্ত অগ্নিপূজকের পাপ আপনার ওপর বর্তাবে।'[২১]

'শান্তি বর্ষিত হোক তার ওপর, যে সত্যের অনুসরণ করে।' পত্রের এতটুকু শুনেই রাগে আগুন হয়ে গেলেন কিসরা পারভেজ। ক্রোধে ফেটে পড়ার উপক্রম হলেন। লাল হয়ে গেল তার চোখ-মুখ। যেন সেখান থেকে আগুনের ধোঁয়া বেরোচ্ছে। ফুলে উঠলো শরীরের শিরা-উপশিরাগুলো। কারণ...

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পত্রটি শুরু করেছেন মহান আল্লাহর নামে। এর পরে এনেছেন নিজের নাম। অর্থাৎ 'আল্লাহ ও মুহাম্মাদ' নাম দুটি চলে এসেছে কিসরার নামের আগেই। তাই তো রাগে-দুঃখে-ক্ষোভে জ্বলে উঠলেন পারস্য সম্রাট কিসরা পারভেজ।

পত্রপাঠকের হাত থেকে পত্রটি থাবা দিয়ে ছিনিয়ে নিল কিসরা পারভেজ। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল সেটি। অথচ তার মূল বক্তব্য কী, তা জানার আদৌ কোনো প্রয়োজনবোধ করল না সে। অযথাই চিৎকার-চেঁচামেচি করে বলতে আরম্ভ করলো—

'সে আমার গোলাম। আর গোলাম কিনা আমাকে এভাবে লিখেছে?'[২২]

এর পর আবদুল্লাহ ইবনু হুজাফাহকে রাজদরবার থেকে বেরিয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন। তাকে বের করে দেওয়া হলো। কোনো কথা না বাড়িয়ে তিনিও রাজদরবার থেকে বেরিয়ে এলেন। তবে এখন তাঁর মনে আনন্দ ধরে না। কারণ, বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশটি যথাযথভাবে পালন করতে পেরেছেন তিনি। পারস্যের মুশরিকদের হিংস্রতার কাছে পরাজিত হতে হয়নি তাঁকে।

---

[২১] তারিখুত-তাবারি : ২/২৯৫-৯৬।

[২২] সহিহ বুখারি, হাদিস নং : ৪৪২৪; আস ওয়াসাইবুল সিয়াসিয়্যা : ৮০-৮২।

রাজদরবার থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন আবদুল্লাহ ইবনু হুজাফাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু। জানেন না, আল্লাহ তাআলা তার কপালে কী লিখে রেখেছেন? তাঁকে কি হত্যা করা হবে, না মুক্তি দেওয়া হবে? এ রকম হাজারও চিন্তা ঘুরপাক খেতে লাগল তাঁর মাথায়; কিন্তু মুহূর্তেই তিনি সব চিন্তাভাবনা ঝেড়ে ফেলে আপন মনে বলতে লাগলেন—

> আল্লাহর কসম! প্রিয়নবির পত্র পৌঁছে দিয়েছি। এখন আমার কপালে যা হয় হোক। আমি আর কোনো কিছুরই পরোয়া করি না।[২৩]

একথা বলে আবদুল্লাহ ইবনু হুজাফাহ আল্লাহর নামে বাহনে সওয়ার হলেন। রওনা হলেন অজানার পথে। পেছনে পড়ে রইল কিসরার সুসজ্জিত রাজদরবার, তার সুবিশাল সামরিক শক্তি ও সমস্ত ভয়ভীতি। বলতে গেলে তিনি সেখানে বপন করে এলেন ইসলামের বীজ। অথচ এরা এতদিন ছিল জরথুস্ত্রবাদে[২৪] বিশ্বাসী।

পারস্য সাম্রাজ্য

অনেকদিক থেকেই পারস্য সাম্রাজ্য ছিল অনন্য। ইতিহাসে এটিই ছিল সত্যিকারার্থে বিশাল সাম্রাজ্য। এর সমৃদ্ধির সময়ও ছিল উল্লেখ করার মতো। ইতিহাস থেকে জানা যায়—সাংস্কৃতিক, সামরিক শক্তি ও সভ্যতার বিবেচনায় আর কোনো সাম্রাজ্য এতদিন স্থায়ী হয়নি। অবশ্য অন্যান্য সাম্রাজ্যের মতোই অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে একে অগ্রসর হতে হয়েছে।

পারস্য সাম্রাজ্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল এই—বাইরের কোনো লোক কখনো পারস্য শাসন করতে পারেনি। সবসময় পারস্যের স্থানীয় লোকেরাই পারস্য শাসন করেছেন। ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, এর ইতিহাস অতি দীর্ঘ।

ঐতিহাসিকরা এ ব্যাপারে একমত যে, খ্রিষ্টপূর্ব ৯ম শতকে আরিয়ান্স বংশের একটি শাখা দক্ষিণ রাশিয়া হতে পশ্চিম ইরানের জগ্রোস পর্বতের মধ্য-এলাকা 'মিদিয়া'য় (মাদায়েন[২৫]) এসে বসতি স্থাপন করে। এ ভৌগোলিক সম্পর্কের কারণে এ সমস্ত

---

[২৩] ফাতহুস বারি ফি শরহিস বুখারি : ৮/১২৭-১২৮; মুহাযারাতু তারিখিল উমামিল ইসলামিয়্যাহ : ১/১৪৭।

[২৪] **পারসিক ধর্ম** : পারস্য সাম্রাজ্যে প্রধান ধর্ম ছিল জরথুস্ত্রবাদ। জরথুস্ত্র বা জরোয়েস্টার ছিলেন এই ধর্মের প্রবক্তা। খ্রিস্টপূর্ব আনুমানিক ১৫০০-৫০০-এর মধ্যবর্তী কোনো একসময় ছিল জরথুস্ত্রের জীবনকাল। সাসানীয়দের আমলে ধর্মটি ব্যাপকতা লাভ করে। আহুরা মাজদা হলো এই ধর্মের সর্বোচ্চ দেবতা। একেশ্বরবাদী এই ধর্ম মতে, মহান জরথুস্ত্র ঈশ্বরকর্তৃক প্রেরীত একজন বার্তাবাহক, তিনি মানুষের নিকট ঈশ্বরের বাণী পৌঁছাতেন। জরথুস্ত্র তাঁর অনুসারীদের অনেক দেবতার উপাসনা না করে একক দেবতা আহুরা মাজদার উপাসনার শিক্ষা দেন। পারস্য সাম্রাজ্যের রাজাগণ ছিলেন ধর্মপ্রাণ জরথুস্ত্রবাদী। কিন্তু তারা অন্যান্য ধর্মের প্রতিও ছিলেন উদার। 'সাইরাস দ্য গ্রেট' নিজে জরথুস্ত্রবাদী হলেও কখনো জোরপূর্বক জনগণের ওপর তা চাপিয়ে দেননি। পরবর্তী রাজাগণও এক্ষেত্রে সাইরাসকে অনুসরণ করেছেন। তারাও জনগণকে তাদের নিজ নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতা দিয়েছিলেন।

[২৫] **মাদায়েন** : এর ইতিহাস 'পারস্যের রাজধানী' শিরোনামে সামনে আসছে।

লোককে মিদ্দি (The Medes) বলা হতো। এ বংশেরই একটি শাখা পূর্ব-ইরানে আগমন করে। এরাই কিরমান প্রদেশ হয়ে প্রবেশ করে পারস্যের মূল ভূখণ্ডে। ইতিহাসে এ গোষ্ঠীর লোকদেরই প্রথম পারস্য-শাসক হিসেবে পাওয়া যায়।

মিদ্দীয় যুগ

দীর্ঘদিন পর্যন্ত মিদ্দীয়রা স্বস্তিতে বসবাস করতে পারেনি। কারণ, তাদের এলাকার সীমান্ত মিলিত ছিল অ্যাসিরীয়দের সীমান্তের সঙ্গে। অ্যাসিরীয়রা প্রায়ই তাদের ওপর আক্রমণ করতো। এজন্য নিরাপত্তার জন্য অ্যাসিরীয়দের কর প্রদান করতো মিদ্দীয়রা। এভাবেই কেটে যায় প্রায় ২০০ বছর। অবশেষে খ্রিষ্টপূর্ব ৭ম শতকে তাদের নেতা হন ডিওকিস (Deioces)। আপন জাতিকে সংঘবদ্ধ করতে সক্ষম হন তিনি। রুখে দাঁড়ায় অ্যাসিরীয়দের বিরুদ্ধে।

তুমুল যুদ্ধ হয় দুদলের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত ডিওকিসের নেতৃত্বাধীন মিদ্দীয়রা অ্যাসিরীয়দেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। হামাদানকে রাজধানী ঘোষণা করে মিদিয়াকে (মাদায়েন) একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। খ্রিষ্টপূর্ব ৬১২ শতকে কিয়াকসারাস (Cyaxaras) অথবা হাখিশতার (খ্রিষ্টপূর্ব ৬৩৩-৫৮৫ শতাব্দী) অ্যাসিরীয়দের শক্তিশালী শহর নিনুয়া জয় করে নেয়। এর সঙ্গে সঙ্গে দজলা নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল নিজ রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। খ্রিষ্টপূর্ব ৫৫০ শতকে কোরশ-ই আজম মিদ্দি জাতির শেষ শাসক আসতিয়াগাস (Astyages)-কে পরাস্ত করে। এরই সঙ্গে মিদ্দীয় জাতির পতন ঘটে।

হখামনি, হাখামানোশি বা একিমেনীয় যুগ

মিদ্দীয় জাতির পরে দ্বিতীয় ঐতিহাসিক বংশধারা হলো একিমেনীয়দের। এদের ঐতিহ্য ও মর্যাদার ব্যাপারে ইরানিরা আজও গর্ব করে থাকে। এদের প্রথম শাসকের নাম সাইরাস বা কোরশ-ই আজম (Cyrus the Great-খ্রিষ্টপূর্ব ৫৫০-৫২৯ শতক)। তিনি মিদ্দি জাতির শেষ শাসক আসতিয়াগাস (Astyages)-কে পরাস্ত করেন এবং নিজ বংশের মুরব্বি হাখামনশ-এর নামানুসারে হখামনি বা হাখামানোশি (একিমেনিয়) যুগের গোড়াপত্তন করেন। তিনি রুশদের এলাকা জয় করতে করতে পুরো এশিয়া মাইনর এলাকার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন।

ব্যাবিলন জয় : কোরশ-ই আজমের বিজয় ধারাবাহিকতার অন্যতম ছিল ব্যাবিলন জয়। ওপিস নামক স্থানে তার বাহিনী ব্যাবিলনীয় সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হয়ে তাদের পরাজিত করে। পরাজয়ের সংবাদ শুনে রাজা নাবুনিডাস (Nabonidus) শহর ছেড়ে

পালিয়ে যায়। কোরশ-ই আজম তার সেবক এবং গুতিয়ামের গভর্নর গুবারুকে ব্যাবিলন পাঠান তা দখলের জন্য।

এ সময় ব্যাবিলনে প্রোপাগান্ডা ছড়ানো হয় যে, কোরশ ব্যাবিলনবাসীর দেবতা মারদুকের নির্দেশে ব্যাবিলনকে মারদুকের অস্বীকারী নাবুনিডাসের হাত থেকে মুক্ত করতে এসেছেন। ফলে যখন তিনি শহরে প্রবেশ করেন, তখন তাকে ব্যাবিলনবাসী রীতিমতো উৎসব করে বরণ করে নেয়। এর পর তার নির্দেশে একটি শিলাস্তম্ভ নির্মিত হয়, যাতে নিজের গুণকীর্তন লিপিবদ্ধ ছিল। ইতিহাসে একে সাইরাস সিলিন্ডার বলা হয়।

ধর্মের প্রতি তিনি ছিলেন বেশ উদার। জনগণকে নিজ নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে পালনের অধিকার দিয়েছিলেন। নির্বাসিত ইহুদিদের তিনি জেরুসালেমে ফেরার ব্যবস্থা করেন এবং তাদের জন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত বায়তুল মুকাদ্দাস পুনর্নির্মাণ করে দেন। তিনি উপলব্ধি করতেন, টেকসই ক্ষমতার জন্য রাজ্য বিস্তার প্রয়োজন। এজন্য তিনি বিজিত অঞ্চলের শাসকদের পরিবর্তন না করে নতুন নতুন এলাকা জয় করতে থাকেন। তখন থেকেই পারস্য সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

সম্রাট কোরশ-ই আজম ক্ষমতায় আরোহণ করেই 'পারস্যের শাহ' উপাধি ধারণ করেন। এভাবেই ধীরে ধীরে পারস্যের সম্রাটরা 'শাহানশাহ' উপাধি ব্যবহার করতে থাকে।

কোরশ-ই আজমের পরে শাসক হন কামবুজিয়া (Cambyses-খ্রিষ্টপূর্ব ৫২৯-৫২১ শতক)। এর পর শাসনভার গ্রহণ করেন দারিয়ুশ (Darius-খ্রিষ্টপূর্ব ৫২১-৪৮৫ শতক)। তিনি বাবেল, মিসর, পাঞ্জাব ও সিন্ধু জয় করেন। এর পর দানিয়ুব নদী পার হয়ে তিনি জয় করেন তারাকিয়া (Thrace)। এর পর মাকদুনিয়া (মেসিডোনিয়া) অধিকার করেন। এরই সঙ্গে তিনি পশ্চিমে আফ্রিকা ও পূর্বে চীন পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করতে সক্ষম হন। তার এ উপর্যুপরি বিশাল বিজয়ের কারণে ইতিহাসে তাকে দারিয়ুশই আজম (Darius the Great) উপাধি প্রদান করা হয়েছে।

এর পর শাসক হয়ে আসেন খাশিয়ারশা জারেকস (Xerxes - খ্রিষ্টপূর্ব ৪৮৫-৪৬৬ শতক)। তার পর শাসক হন আরদশির (Artaxerxes - খ্রিষ্টপূর্ব ৪৬৫-৪২৫ শতক)। অতঃপর শাসক হন ২য় দারিয়ুশ (খ্রিষ্টপূর্ব ৪২৪-৪০৪ শতক)। তার পর তখতে বসেন ২য় আরদশির (খ্রিষ্টপূর্ব ৪০৪-৩৮৫ শতক)। শাসক হয়ে এর পর আসেন ৩য় আরদশির (খ্রিষ্টপূর্ব ৩৮৫-৩৩৮ শতক)। সবশেষে শাসক হয়ে তখত অলংকৃত করেন ৩য় দারিয়ুশ (খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩৭-৩৩০ শতক)।

আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট

ব্যতিক্রম : আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট (Alexander the Great) ওরফে সিকান্দার রুমি এই ৩য় দারিয়ুশকে পরাস্ত করেন। এর মধ্য দিয়ে একিমেনীয় রাজাদের পতন ঘটে। কোরশ-ই আজম (Cyrus the Great) ও দারিয়ুশই আজম (Darius the Great)-এর শিলালিপিতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

এখানেই পারস্য শাসনের সামান্য একটু ব্যতিক্রম ঘটে। অর্থাৎ একমাত্র সিকান্দার রুমিই কেবল বাইরে থেকে এসে পারস্য সাম্রাজ্য শাসন করার সুযোগ লাভ করেন।

ইউনানি (সেলিউকীয়) রাজত্ব

একিমেনীয়দের পরাজিত করে পারস্য সাম্রাজ্য বিজয়ের অল্প কয়েক বছর পরই আলেকজান্ডার (Alexander the Great) মাত্র ৩২ বছর বয়সে ব্যাবিলনে মৃত্যুবরণ করেন; কিন্তু তিনি কাউকেই তার সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করে যাননি। ফলে আলেকজান্ডারের পর পরই সুবিশাল মেসিডোনীয় সাম্রাজ্যের অধিপতি কে হবেন, তা নিয়ে শুরু হলো বাক-বিতণ্ডা। মৃত আলেকজান্ডারের জেনারেলরা লিপ্ত হলেন ক্ষমতার দ্বন্দ্বে। বেশ কিছু যুদ্ধের পর সুবিশাল মেসিডোনীয় সাম্রাজ্যের সাতরাপ বা প্রদেশসমূহ চারজন জেনারেলের মাঝে ভাগ হয়ে যায়। তারা হলেন :

১. ক্যাসান্ডার (Cassander)।

২. টলেমি প্রথম (Tolemy I Soter)।

৩. লাইসিম্যাকাস (Lysimachus) এবং

৪. সেলিউকাস নিকেটর (Seleucus Nicator)।

তাদের প্রাপ্ত অঞ্চলের তালিকা নিম্নরূপ :

১. ক্যাসান্ডার (Cassander) লাভ করেন গ্রিস ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল।

২. টলেমি প্রথম (Tolemy I Soter) প্রাপ্ত হন মিসর এলাকা।

৩. লাইসিম্যাকাসকে (Lysimachus) দেওয়া হয় থ্রেস অঞ্চল।

৪. সেলিউকাস নিকেটর (Seleucus Nicator) পান পারস্য, মেসোপটেমিয়া এবং মধ্য-এশিয়ার নিয়ন্ত্রণ।[২৬]

---

[২৬] আলেকজেন্ডার দি গ্রেটের মৃত্যুর পর তার সুবিশাল সাম্রাজ্যের সাতরাপ বা প্রদেশগুলো তার নিযুক্ত সেনাপতি এবং প্রাদেশিক শাসকদের মাঝে বিভক্ত হয়ে যায়। উল্লিখিত চারজন জেনারেল ছাড়াও আরও প্রায়

৩০১ খ্রিষ্ট-পূর্বাব্দে সংঘটিত ইপসাসের যুদ্ধে অ্যান্টিগোনাসকে পরাজিত করার মাধ্যমে সেলিউকাস আনাতোলিয়া (আধুনিক তুরস্ক) এবং সিরিয়ার উত্তরাংশ নিজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

আলেকজান্ডারের এই চারজন জেনারেলের মধ্যে সেলিউকাস নিকেটরকেই সবচেয়ে সফল বলে বিবেচনা করা হয়। কেননা একমাত্র তিনিই আলেকজান্ডারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা, দক্ষ আমলাতন্ত্র, লাভজনক বাণিজ্য এবং সফল সামরিক অভিযানের মাধ্যমে একটি বহুজাতিক সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করতে সক্ষম হন।

সেলিউকাসের মৃত্যুর পর তার ছেলে প্রথম অ্যান্টিওকাস সাম্রাজ্যের হাল ধরেন। তিনি পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সর্বদা পারসিক অভিজাতদের সঙ্গে পারিবারিক বন্ধনের মাধ্যমে সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন। তার শাসনামলে রাজ্যশাসন-ব্যবস্থা আরো দৃঢ় ও সুসংহত হয়।

এই শাসনামলে পারস্য সাম্রাজ্য ভূমধ্যসাগরীয় সমুদ্রবন্দরগুলোর অধিকারকে কেন্দ্র করে মিসরের টলেমিদের সঙ্গে দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী শত্রুতায় জড়িয়ে পড়ে, যা প্রায় পরবর্তী ৭০ বছর পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। এই সময়কালে সাতটি যুদ্ধ সংগঠিত হয়, যা ইতিহাসে সিরিয়া যুদ্ধ নামে পরিচিত।

প্রথম অ্যান্টিওকাসের পুত্র দ্বিতীয় অ্যান্টিওকাসের সময় অনেক এলাকা হাতছাড়া হয়ে যায়। এসময় সেলিউকিয়দের এশিয়া মাইনরে সেল্টিক আক্রমণের মুখোমুখি হতে হয়। এই সুযোগে ব্যাক্ট্রিয়া, পার্থিয়া, কাপাডোসিয়ার মতো প্রদেশগুলো নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করে বসে।

তবে সম্রাট তৃতীয় অ্যান্টিওকাসের সময়ে অবস্থার উন্নতি ঘটে। তিনি হারানো রাজ্যগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিতে থাকেন। তার শাসনামলে সেলিউকিয়দের পুনর্জাগরণ ঘটার পাশাপাশি সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ বিস্তার ঘটে।

ততদিনে পারস্য সাম্রাজ্যের পশ্চিমে রোম সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটে যায়। গ্রিসের ছোট ছোট নগর রাষ্ট্রগুলোয় প্রভাব বিস্তারকে কেন্দ্র করে ১৯৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের দিকে রোম-পারস্য স্নায়ুযুদ্ধের সূচনা হয়। ২১৮-২০১ খ্রিষ্ট-পূর্বাব্দে সংঘটিত দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধে রোমানরা কার্থেজের বিপক্ষে জয় লাভ করলে সম্রাট তৃতীয় অ্যান্টিওকাস রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন। ১৯১ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে থার্মোপাইলির প্রান্তরে এবং ১৯০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ম্যাগনেসিয়ার প্রান্তরে তিনি রোমানদের মুখোমুখি হন এবং দুবারই

পনেরজন প্রাদেশিক শাসকের মাঝে ভাগ হয়ে যায় গ্রীস থেকে শুরু করে দক্ষিণ এশিয়ার সিন্ধু উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত সুবিশাল এই সাম্রাজ্য।—নিরীক্ষক